Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
Volume-XIII, Issue-I, October 2024, Page No.87-98
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

মধুসূদন অনুসারী উত্তর-পূর্বের কবি রামকুমার নন্দী মজুমদার

মানচিত্র পাল
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্ববিদ্যালয়, হোজাই, অসম, ভারত

Abstract:
Ramkumar Nandi Majumdar (1831-1904) was one of the modern poets of North-East India and the Barak-Surma Valley, who followed Madhusudan. He was born in Bejura in Sreehatta district. He was multi-talented. He was a poet, a saint, a mother lover; on the other hand, he was modest and averse to publicity. Poverty was a constant companion of his childhood. As a result, it was not possible for him to get higher education institutionally. However, with his own tireless efforts, sitting on the edge of Bengal he devotedly studied literature. But how many of us know that identity? Apart from Sreehatta, Tripura, Mymensingh and Dhaka, the people of the Bhagirathi coastal region seem to know very little. Consequently, the purpose of this essay is to introduce Ramkumar Nandi Majumdar and his works to those who still have them today.

Keywords: Essay, Madhusudan, Poem, Ramkumar Nandi Majumdar, Song.

উত্তর-পূর্ব ভারত তথা বরাক-সুরমা উপত্যকার উনিশ শতকের আধুনিক কবিদের মধ্যে অন্যতম প্রচারবিমুখ মধুসূদন অনুসারী কবি হলেন রামকুমার নন্দী মজুমদার (১৮৩১-১৯০৪)। তাঁর জন্ম শ্রীহট্ট জেলার বেজুড়াতে। এ সম্পর্কে পদ্মনাথ ভট্টাচার্য বিদ্যাবিনোদ জানিয়েছেন---

> "কবি রামকুমার নন্দীর জন্মস্থান শ্রীহট্ট জেলার অন্তর্গত বেজুড়া নামক স্থানে।..."[১]

তিনি ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। একদিকে যেমন ছিলেন কবি, সাধক, মাতৃপ্রেমী, ভারতীয় পুরাণের প্রতি অনুগত অপরদিকে ছিলেন রসিক, বিনয়ী ও প্রচার বিমুখ। দারিদ্র্য ছিল তাঁর ছেলেবেলার নিত্য সঙ্গী। ফলে, প্রাতিষ্ঠানিকভাবে উচ্চশিক্ষা লাভ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। তবু, নিজের নিরলস প্রচেষ্টায় প্রান্তবঙ্গে বসে একনিষ্ঠভাবে সাহিত্যচর্চা করে গেছেন। কিন্তু সেই পরিচয় শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা, ময়মনসিংহ ও ঢাকা প্রভৃতি অঞ্চলের লোকেদের কাছে জানা থাকলেও ভাগীরথী তীরবর্তী অঞ্চলের লোকেদের কাছে অজানা ছিল বলেই মনে হয়। এ বিষয়ে বলেছেন পদ্মনাথ ভট্টাচার্য বিদ্যাবিনোদ---

> "... শ্রীহট্ট ত্রিপুরা ময়মনসিংহ, বড় জোর ঢাকা এই কয় জেলার লোক ব্যতীত কবি রামকুমারের নাম কেহ শুনিয়াছে কি না সন্দেহের বিষয়। ..."[২]

প্রতিভার পরিচয় কেবলমাত্র আঞ্চলিকতার দ্বারা বিচার করা যায় না। এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত কবি রামকুমার নন্দী মজুমদার। তাঁকে দেখা যায়, সরকারি কর্মে নিযুক্ত থেকেও নীরবে-নিভৃতে বাংলা সাহিত্যকে

বিচিত্রপ্রকার রসদ দিয়ে নানাভাবে সমৃদ্ধ করে গেছেন। তার মধ্যে কিছুটা প্রকাশ পেয়েছে, আর বাকিটা আজও প্রকাশের সুযোগ পায়নি। এ প্রসঙ্গে তাঁর প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত রচনাকর্মের দিকটি উল্লেখ করা যেতে পারে[৩]---

প্রকাশিত রচনাকর্ম:

ক. পরমার্থ সঙ্গীত (তৃতীয় মুদ্রণ ১৯৭৫)
খ. বীরাঙ্গনা পত্রোত্তর কাব্য (১৯৯৫)
গ. উষোদ্বাহ কাব্য (দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩০৯)
ঘ. কবি রামকুমার নন্দী মজুমদার রচিত কাব্যগীতি সঞ্চয়ন
ঙ. মালিনীর উপাখ্যান (১৯৯৭)
চ. ভাগবতীর জন্ম এবং বিবাহ (২০০৩-২০০৪)
ছ. নবপত্রিকা কাব্য (২০০৯-২০১০)
জ. কংসবধ

অপ্রকাশিত রচনাকর্ম:

১. রাসলীলা (যাত্রাপালা)
২. চণ্ডী (যাত্রাপালা)
৩. উমা আগমন (যাত্রাপালা)
৪. ১৩০৫ সালের বোধন (পাঁচালি)
৫. কলঙ্কভঞ্জন (পাঁচালি)
৬. রাসপঞ্চাধ্যায় (ভাগবত পুরাণের শ্লোক সঙ্কলন, অসমাপ্ত)
৭. প্রবন্ধমালা। পাঁচটি কবিতার সঙ্কলন। (কবিতাগুলির নাম মাতৃভক্তি, মহারাণী স্বর্ণময়ী, কবিতার প্রতি, জাগ্রত স্বপ্ন, স্বর্গীয় কবিবর বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যু উপলক্ষে)।
৮. হোলিগান (হোলিগানের সঙ্কলন)
৯. জীবন্মুক্তি (সংস্কৃত নাটক প্রবোধচন্দ্রোদয়-এর গদ্য রূপান্তর)

এছাড়া, 'শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত' (উত্তরাংশ) গ্রন্থে রামকুমার নন্দী মজুমদারের আরও বেশ কয়েকটি রচনার পরিচয় রয়েছে। সেগুলি হল[৪]----

১. দশমহাবিদ্যা (খণ্ডকাব্য)
২. বলদমহিমা (প্রহসন)
৩. লক্ষ্মী সরস্বতীর দ্বন্দ্ব (সঙ্গীতের পালা)
৪. ঝুলনযাত্রা (সঙ্গীত সঙ্কলন)
৫. দোলযাত্রা (সঙ্গীত সঙ্কলন)
৬. পদাঙ্কদূত (সংস্কৃত দূতকাব্যের বঙ্গানুবাদ)
৭. দেবীর বোধন (যাত্রাপালা)

পাঠ্যপুস্তক:

১.গণিততত্ব (১২৮০)

উপরোক্ত রচনাকর্মগুলি পরিচয় দিচ্ছে, রামকুমার নন্দী মজুমদারের মেধা, পাণ্ডিত্য ও লেখনী শুধুমাত্র একটি বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি, বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন উপকরণে তাঁর লেখনি প্রবেশ করেছে। এ প্রসঙ্গে তাঁর সৃষ্ট কবিরগান, পাঁচালি, যাত্রাপালা, সংগীত ও কাব্য ইত্যাদি থেকে সামান্য পরিচয় সংক্ষিপ্তাকারে উল্লেখ করা যেতে পারে---

কবির গান: রামকুমার নন্দী মজুমদার আধুনিক সাহিত্যের মতো প্রাচীন সাহিত্যেও মৌলিক প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। তাঁর রচিত প্রাচীন সাহিত্যের উপকরণগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল কবির গান, পাঁচালি ও যাত্রা প্রভৃতি। এর মধ্যে অন্যতম হল কবির গান। কবির গান রচনা করে তিনি কীভাবে রসিকতার মধ্য দিয়ে বিপক্ষদের প্রশ্নের সম্মুখীন করাতেন তার নমুনা নিচে দেখানো হল----

সখী-সংবাদের জবাব

> "(প্রশ্নে বৃন্দাকে রাধিকা বলিতেছেন, তুমি যত আশা দিয়াছিলে সব মিথ্যা হইল, কৃষ্ণকে মথুরা হইতে আনিতে পারিলে না, আমার মনকে একবার মথুরা পাঠাইব।)
> রামকুমার নন্দীর রচিত উত্তর—শুন শ্যামপ্রেয়সি, ওগো রাই রূপসি, মধুরার যত বিবরণ। যেয়ে নূতন রাজ্যে, পেয়ে নতুন ভার্য্যে, সে কার্য্যে আছেন কৃষ্ণধন। ..."[৫]

পাঁচালি: কবির গানের মতো রামকুমার নন্দী পাঁচালি রচনাতেও দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর রচিত পাঁচালিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল: কলঙ্কভঞ্জন, লক্ষ্মী ও সরস্বতীর দ্বন্দ্ব, ১৩০৫ সালের বোধন। জানা যায়, তাঁর রচিত পাঁচালি জনপ্রিয়তার সঙ্গে অভিনয়ও হত। ব্রাহ্মণপণ্ডিত ও ভদ্রলোকেরা অভিনয় দেখে-শুনে প্রশংসা করতেন। তবে, তাঁর সৃষ্ট পাঁচালির অন্যতম গুণ আঞ্চলিক শব্দের, সংস্কৃত মন্ত্রের ও হিন্দুপুরাণের ব্যবহার। এ প্রসঙ্গে তাঁর রচিত 'কলঙ্কভঞ্জন' পাঁচালি থেকে একটি উদাহরণ দেখে নেওয়া যেতে পারে, যেটি রচিত হয়েছে ত্রিপদীছন্দে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি রাধার উক্তি দিয়ে এভাবে----

> "... কত আশা দিয়া আগে এখন এনে মধ্যভাগে
> কলঙ্ক পাথারে তারে ফেলে।
> বুঝতে নারি কি কপাল উল্টা বাতাসে তুলে পাল
> গোপাল হে তুমি পলাইলে।।
> তাহে হইল যে উৎপাত লোক নিন্দা মহাবাত
> জটিলার গঞ্জনা বৃষ্টি ঝড়।
> বিপক্ষ বদনাকাশে হাস্য-সৌদামিনী ভাসে
> গরজে আয়ান-জলধর।।
> এমন সময়ে হরি উঠে দুঃখের লহরী
> নাবিক বিহনে তরী
> ডুবে যায় কলঙ্ক জীবনে। ..."[৬]

শিলচরে থাকাকালীন কবির দু'জন অন্তরঙ্গ বন্ধু কবিকে 'কাক' বলে রসিকতা করতেন। আর কবি রসিকতা করে উভয় বন্ধুকে ডাকতেন 'নাপিত' ও 'সূত্রধর' বলে। পরবর্তীকালে বন্ধুদের ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি নিয়ে সংস্কৃত ভাষায় দু'টি মন্ত্র লেখেন। মন্ত্র দু'টি নিম্নরূপ----

১. নাপিত:

"ক্ষুর ত্বং ক্ষৌরিকালেচ কেশশ্মশ্রু বিনাশকঃ
তীক্ষ্ণধারসমাযুক্তঃ অস্ত্ররাজো নমোহস্তুতে।
এতানি সচন্দন পুষ্পবিল্বপত্রানি ক্ষুং ক্ষুরায় নমঃ।।
নরণিকে নমস্তেস্তু নখরাগ্রবিনাশিনি। ..."[৭]

২. সূত্রধর:

"হে বর্ম্মে ব্রহ্মণোস্ত্রং ত্বং ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মিকা।
শুষ্কং সুকঠিনং কাষ্ঠং তৎক্ষ্মাচ্ছিদ্রকারিণী।।
কাষ্ঠমুষ্ট্যোর্দ্ধভাগে তে অধো লৌহশলাকয়া।
ধনুর্ঘষণসংত্রস্তা সদা ঘূর্ণিতমধ্যমা।। ..."[৮]

পাঁচালিতে সংস্কৃত মন্ত্রের মতো গ্রাম্যভাষায় রচিত মুসলমানি শব্দমিশ্রিত ছড়াও ব্যবহার করেছেন। ছড়াতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি এবং বরাক-সুরমা অঞ্চলের বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি কবির সুগভীর ভাবনার প্রকাশ ঘটেছে যেন। যেমন----

"আল্লাজি! হেকমতে বানাইলায় কেলার গাছ
তার খোলের উপর খোল।
কাইঞ্জল খাই, বুগুল খাই, থুরের বিরান খাই
কাঁচাকেলার ছালন খাই, পাকনা কেলা ছুল্যা খাই,
পাতা কাট্যা খানা খাই, কোন চিজ যায়না বরবাদ।
খোল বিনা হয় না রে ভাই হেঁদুর ছরাদ!! ইত্যাদি"[৯]

যাত্রাপালা: যাত্রাপালা রচনাতেও কবি রামকুমার নন্দী বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। সর্বমোট তিনি এগারোটি যাত্রার পালা রচনা করেন। এগুলি হল---

১. নিমাই সন্ন্যাস ২. সীতার নবনবাস ৩. বিজয়বসন্ত ৪. পশ্চাৎ ৫. পদাঙ্কদূত ৬. কংশবধ ৭. উমার আগমন ৮. মার্কেণ্ডেয় চণ্ডি ৯. রাসলীলা ১০. দোলযাত্রা ১১. ঝুলনযাত্রা।[১০] এরমধ্যে প্রথম তিনটি পালা রচনা করেন শিলচরে বসে। এবং পরে তা প্রসিদ্ধ যাত্রাওয়ালাদের দ্বারা অভিনীত হয়।[১১] যাত্র পালাগুলিতে ব্যবহৃত উপকরগুলির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ গানের ব্যবহার। গানে ব্যবহৃত মোটিফ চরিত্রগুলির মধ্যে অন্যতম হলেন কৃষ্ণ চরিত্র। প্রসঙ্গক্রমে 'দোলযাত্রা' পুথিতে ব্যবহৃত গানের কিছুটা অংশ তুলে ধরা হল----

"এক কৃষ্ণ সহিতে শত শত রমনী খেলেরে।
নিরখি একই শ্যামমুরতি সকল যুবতী ভুলেরে।।
যেন এক চন্দ্র উদয়ে শত শত কুমুদী হাসেরে।
এক সরসী সলিলে শত শত নলিনী ভাসেরে।।
এক সিন্ধু সহিতে শত শত তটিনী মিলেরে।
এক বংশীরবে শত শত কুরঙ্গী ভুলেরে।। ..."[১২]

সুতরাং, তিনি যে পাঁচালি ও যাত্রাপালা রচনায় মৌলিক প্রতিভার পরিচয় রাখতে পেরেছিলেন তা বলাই বাহুল্য। এর সমর্থন মেলে পণ্ডিতজনদের মন্তব্যে----

"কবি রামকুমার উৎকৃষ্ট পাঁচালী ও যাত্রাকার বলিয়া বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার রচনায় শ্রীহট্ট অঞ্চলের অনেক লৌকিক ভাব, ধারণা, রীতিনীতি, তাহাদের গ্রাম্যসৌন্দর্য্যে ভূষিত হইয়া তদ্দেশবাসীদের অপূর্ব্ব উপভোগ্য সামগ্রী প্রস্তুত হইয়াছে। ..."[১৩]

কবিতা: বাঙালি হল মাতৃপ্রেমী জাতি। কবি রামকুমার নন্দীও ছিলেন মাতৃপ্রেমী কবি-সাধক। তাই তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যকর্মে একাধিক বার মায়ের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা ব্যক্ত হতে দেখা যায়। এর প্রমাণ রয়েছে তাঁর রচিত কবিতায়। কবিতা রচনায় তিনি দাশুরায়, রামপ্রসাদ ও মধুসূদন দত্ত প্রমুখদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। তাঁর রচিত আধুনিক সাহিত্যের অন্তর্গত কবিতাগুলিত মধ্যে অন্যতম 'মাতৃভক্তি কবিতা'। কবিতাটিতে মায়ের প্রতি সন্তানের ভক্তি-শ্রদ্ধার দিকটি ব্যক্ত হতে দেখা যায়----

"... মাতৃগুণ অবশ্যই জন্মে সন্তানেতে
শৃগালী কি পারে কভু সিংহ প্রসবিতে?
পিতৃগুণ অল্পমাত্র প্রবেশে সন্তানে
কিন্তু জননির গুণ পূর্ণ পরিমাণে। ..."[১৪]

মর্ত্যভূমি থেকে বিদায়কালে মায়ের প্রতি কবি লিখেছিলেন—

"মাগ! আমার আর কে আছে।
আমায় সেকালে ভুইলনা যখন যেতে হবে কালের কাছে।।
আমি যে ভুলেছি তোমায় কেবল তোমার মায়ার ভুলে।
আমার এই ভয় মা আমার মত তুমি আমায় ভুল পাছে।। ..."[১৫]

মায়ের মতো জন্মভূমির প্রতিও ছিল কবির গভীরপ্রেম। তাই বিদায় কালে জন্মভূমিকে নিয়ে লিখেছেন---

"কৈশোরে যৌবনে ধন উপার্জনে
যাইতাম যবে তোমায় ছাড়ি।
তোমার লাগিয়া কাঁদিত পরাণ
বহিত কতই নয়নবারি।।
নদীহীনা তুমি তথাপি তোমারে
গঙ্গাতির হ'তে পবিত্র মানি।
কুরূপা হলেও সন্তানের যেন
প্রিয়দর্শনীয়া নিজ জননী।।"[১৬]

কবি রামকুমার নন্দীর সমকালে শ্রীহট্টীয় সমাজে ভট্টদের প্রবল প্রভাব ছিল। তাঁদের খালি হাতে বিদায় করা যেত না। বাণিয়াচঙ্গের প্রসিদ্ধ জয়চন্দ্র ভট্ট প্রতি বৎসর শিলচরে এসে কবিতা শুনিয়ে কিছু উপার্জন করতেন। একদিন কবি রামকুমার নন্দীকে দেখামাত্রই বললেন----

"বাবু যশকীর্ত্তি কবিতায় লেখি। আগে বিদায় কর দেখি!"[১৭]

এর উত্তরে কবি রামকুমার নন্দী ভট্টকে পরের দিন আসতে বলেন। এবং কবি সেই ফাঁকে রাতে একটি কবিতা লেখেন। কবিতাটির নাম রাখা হয় 'ভাটের কবিতা'। কবিতাটিতে রসিকতা পাশাপাশি কবির অর্থ সংকটের দিকটিও বর্ণিত হয়েছে। যেমন---

"যার যার যশকীর্ত্তি কবিতায় লেখ।

তাঁরা আগে কি রকম বিদায় করেন দেখ।।
আমার যশ নাই, পৌরুষ নাই, নাই টাকাকড়ি।
এখন তোমার লেগে কার ঘরে গে' করব আমি চুরি।"[১৮]

সংগীত: কবি রামকুমার নন্দী ছিলেন সংগীত প্রিয় মানুষ। বিভিন্ন সময়ে নানারকম বিষয়কে নিয়ে তিনি একাধিক গান রচনা করেছিলেন। গানগুলিতে প্রতিদিনের জীবনে ব্যবহৃত ক্ষুদ্র উপকরণ থেকে শুরু করে আধ্যাত্মিকতার বিষয়ও জায়গা করে নিয়েছে। তাঁর সৃষ্ট গানগুলিকে আমরা শ্রেণিবিভাগ করে তুলে ধরছি, এভাবে----

১. পাঙ্খাওয়ালা
২. পারস্যশব্দ মিশ্রিত গান
৩. ব্যাধিগান
৪. রামপ্রসাদীসুরে গান
৫. নন্দীবিদায় গান
৬. খাসারির ডাইল বিষয়ক গান
৭. মাতালের গান
৮. দেহতত্ত্বমূলক গান ইত্যাদি।[১৯]

কবি রামকুমার নন্দী-র সমকালে আজকের মতো ইলিক্ট্রিক পাখার ব্যবহার এতটা রমরমা ছিল না। ফলে, সেইসময় গ্রীষ্মকালে অফিসে পাখা চালানোর তথা টানার জন্যে পাঙ্খাওয়ালা নিয়োগ করা হত। পাঙ্খাওয়ালাদের পাখা টানবার সাথে সাথে বাবুদের বাড়ির অন্যান্য কাজও করে দিতে হত। তার মধ্যে ছিল মাছ ধরে আনা। কবি রামকুমার নন্দীর পাঙ্খাওয়ালা প্রতিদিন মাছ সংগ্রহ করে কবির জন্যে নিয়ে আসতেন। কিন্তু একদিন আনতে অসমর্থ হন। আর এরই ফলস্বরূপ তিনি লিখেছিলেন নিম্নোলিখিত গানটি--

"তুই বেটা পাঙ্খাওয়ালা সরকারী।
বাসার কাজ করছ না চার কড়ি।।
ঘুম্‌ত উঠ্যা যাছ, আনছ চাট্যা মাছ্
তিনজনের এক বেনুন হয় না কেমন পেলুন বাছ।
খাই বাইঙন ডেঙ্গা কুমড়া ঝেঙ্গা চার আনাজের তরকারি।
আবার কাছারিত যাইয়া থাকছ্ তক্তা বিছাইয়া
পাঙ্খার রসি হাতে লৈয়া থাক্‌স চিৎ হইয়া
যখন সাহেবে বলে জোরসে টান— তখন উঠছ ফাল্‌মারি।।"[২০]

জানা যায়, গানটি পরে জনপ্রিয়তার সাথে শহরে ছড়িয়ে পড়ে। এবং গানটি এতটাই জনপ্রিয়তা পেয়েছিল যে, পাঙ্খাওয়ালাদের দেখলেই গানটি ব্যবহার করা হত।

কবি রামকুমার নন্দী বাল্যকালে পারস্য ভাষা শিক্ষা লাভ করেন। তাঁর এ শিক্ষা ব্যর্থ হয়নি। কেননা, পারস্য শব্দ ব্যবহার করে তিনি পরে একটি গানও রচনা করেছিলেন। গানটি রচনা করেছিলেন সংগীত ব্যবসায়ীর অনুরোধে মূলত মুন্‌সি ও মৌলবিদের খুশি করবার সূত্রে। গানটি হল---

"... হাজারো গোল দেখাময় এক নাহি জাবেদান।

কাল রাহা আজ নাহি নাম ও নিশান।।
ছোন বে কুমার হো তু কেয়ছে নাদান।
করো আপনা দিল্‌মে উসকা জোস্তছ্ তামাম।।”[২১]

অর্থাৎ হাজার হাজার ফুল দেখলাম, একটিও চিরস্থায়ী নয়। যেটা কাল ছিল আজ তার নামগন্ধও নেই। শুন কুমার, তুমি কেমন বির্বোধ। নিজ অন্তরে তাঁর একাকী অন্বেষণ করো।

‘দ্রোপদীর বস্ত্রহরণ’ পালায় একটি গান ছিল। গানটির নাম ‘কোথায় সঙ্কটের ঔষধি’। গানটি কোন এক ব্যক্তির খুব পছন্দের ছিল। কিন্তু পদ ভুলে যাওয়ায় কবি রামকুমার নন্দীর দ্বারস্থ হন। রামকুমার নন্দী নিচে উল্লিখিত গানটি লেখে নেন---

“কোথায় সঙ্কটের ঔষধি।
তুমি জ্বরের কুইনাইন, তুমি কৃমির সান্টুনাইন,
আবার পুরাণা জ্বরেতে তুমি ডিঃ গুপ্ত সমান।
আমি কত বার কব আর তুমি কলেরা মিক্‌শ্চার
আবার কফাধিকারে বৃহৎ চন্দনাদি।।
হলে সন্নিপাত রোগ, তুমি বট চতুর্ম্মুখ
তোমার নিমেষে উপজে কত কোটি চতুর্ম্মুখ।
সদা লক্ষ্মীসহ বাস, তুমি লক্ষ্মীবিলাস
তোমার নাম নিলে দূরে পলায় ভবব্যাধি।।”[২২]

রামপ্রসাদী সুরে রচিত কবির বহু গানের পরিচয় পাওয়া যায়। গানগুলির বিষয় দেহতত্ত্ব। গানগুলিতে যেন কবির উচ্চ অঙ্গের সাধনার দিকটি উন্মোচিত করে। যেমন----

ক.

“কও দেখি মন কে হই আমি।
আমায় পার কি হে চিন্তে তুমি।।
কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য্য নই যে আমি।
নৈ যে আকাশ অনিল আর অনল সলিলভূমি।।
প্রাণ আদি পঞ্চ বায়ু দশেন্দ্রিয় হইনা আমি।
ওরে তুমি আমায় চিনবে কিসে চিন্তে নারি আমায় আমি।। ...”[২৩]

খ.

“... মাগো, আমি জন্মাবধি নিরবধি জানিনা গো মা বিনে।।
জনক মারিতে গেলে, কিম্বা কোন ভয় পেলে
ছেলে যায় জননীর কোলে।
মা যদি গো নিজে মারে, তবু কাঁদে মা মা ক’রে
কাঁদে কি গো পিতা ভ্রাতা বলে।। ...”[২৪]

গ.

কবি অ্যাকান্টের কাজে যুক্ত থাকাকালীন রামপ্রসাদী সুরে গানটি রচনা করেন----

মনরে তোরে বলি আমি
ও কার জমাখরচ লেখছ তুমি।।
হিসাবের মুহুরি হয়ে পরের হিসাব লেখছ তুমি।
করে নিজের হিসাব দেখ্‌লে নারে
লাভখেসারত ফাজিল কমি।। ...”[২৫]

খাজাঞ্চির কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করবার পর শিলচর পরিত্যাগ করার সময় কবি ‘নন্দীবিদায়’ নামে একটি গান রচনা করেন। গানটির নামকরণে কবি ইঙ্গিত দিয়েছেন এ আসলে কবিরই বিদায়। গানটি হল---

“নেও মা তোমার তহবিলদারী।
আমি এখন চাকরি কর্ত্তে নারি।। ...
সকল কাজের নিকাশ করে কেটে দেও মা কর্ম্মডুরি।
এখন বিনা কাজে খেতে দিও
চাই না গো আর টাকা কড়ি।।
আমার নিজের পুঁজি অনিয়মে বসেছি সব খর্চ্চ করি।
ও মা নিয়ম ছিল দিনে রেতে
একুশ হাজার ছয় শ কড়ি।।
তোমার তহবিল ঠিক আছে মা
কমে নাই তার গণ্ডা বুড়ি। ...”[২৬]

পেনশন নিয়ে বাড়িতে থাকার সময় বর্ষার প্রভাবে কবির যেন বড় ক্ষতি হয়েছিল। ফলে, কবির ঘরে দেখা দিয়েছিল খাদ্য সংকট। সেসময় কবির ঘরে একমাত্র খাবারের বস্তু ছিল খাসারির ডাল। আর এই ডালকে নিয়েই কবি গান রচনা করলেন----

“খাসারি তুমি জীবের কর্ণধার।
তুমি খাবার বেলা কর্ণে ধরে ক্ষুধাসিন্ধু কর পার।।
তোমায় দেশবিদেশে অনেক লোকে
সেবা করে অনিবার।
হলে অদর্শন বর্ষাকালে মৎস্য কূর্ম্ম অবতার।। ...”[২৭]

কবি নিজের প্রচেষ্টায় একাধিক ভাষা রপ্ত করেছিলেন। তারমধ্যে ছিল ইংরেজি ভাষা। এ ভাষা শেখাও তাঁর বিফলে যায়নি। এর পরিচয় রেখে গেছেন বন্ধুর অনুরোধে লেখা ‘মাতালের গান’ অংশটির মধ্য দিয়ে। যেমন----

“...আস্‌ছে নতুন স্বর্গের Brandy সুধা
Ship ভরে India তে।
ছিল সেই সুধা Very nasty, New সুধা কতই মিষ্টি
রকম রকম হচ্ছে সৃষ্টি আসছে সদা ইষ্টিমারে।। ...”[২৮]

বীরাঙ্গনা পত্রোত্তর কাব্য: উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যের মৌলিক সৃষ্ট কাব্যগুলির মধ্যে অন্যতম হল রামকুমার নন্দী মজুমদারের 'বীরাঙ্গনা পত্রোত্তর' কাব্য। কাব্যটির রচনাকাল ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দ। কাব্যটি লেখা হয়েছিল বরাক উপত্যকার কাছাড় জেলার শিলচর শহরে। এ সম্পর্কে ভূদেব চৌধুরী জানিয়েছেন----

> "পত্রোত্তর কাব্যটি রচিত হয়েছিল সেদিনের অখণ্ড বাংলাদেশের রাষ্ট্রিক ভূগোলের সীমান্ত-বহির্ভূত এলাকায়, তখনকার আসাম প্রদেশের অভঙ্গ সুরমা উপত্যকায়, এখনকার বিভগ্ন বঙ্গ আসামে, আসাম রাজ্যের বরাক উপত্যকায়, শিলচর শহরে।"[২৯]

উল্লেখ্য যে, মধুসূদনের রচিত 'বীরাঙ্গনা' (১৮৬১) কাব্যের দশ বছর পরে রামকুমার নন্দী মজুমদারের 'বীরাঙ্গনা পত্রোত্তর' কাব্যটি রচিত হয়েছিল। উভয় কবির কাব্য সময়ের দিক থেকে যেমন আলাদা, তেমনি গঠনশৈলীর দিক থেকেও ছিল স্বতন্ত্র। এক্ষেত্রে দেখা যায় যে, মধুসূদনের কাব্যে পত্রগুলি লিখেছিলেন নারীরা পুরুষদের প্রতি। যেমন---

১. দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলা
২. সোমের প্রতি তারা
৩. দ্বারকানাথের প্রতি রুক্মিনী
৪. দশরথের প্রতি কেকয়ী
৫. লক্ষ্মণের প্রতি সূর্পণখা
৬. অর্জ্জুনের প্রতি দ্রৌপদী
৭. দুর্য্যোধনের প্রতি ভানুমতী
৮. জয়দ্রথের প্রতি দুঃশলা
৯. শান্তনুর প্রতি জাহ্নবী
১০. পুরুরবার প্রতি উর্ব্বশী
১১. নীলধ্বজের প্রতি জনা[৩০]

কিন্তু রামকুমার নন্দী মজুমদারের কাব্যে পত্রগুলি নারীদের উত্তর দেবার সূত্রে পুরুষেরা নারীদের উদ্দেশ্যে লিখেছিলেন। যেমন,

১. শকুন্তলার প্রতি দুষ্মন্ত
২. তারার প্রতি সোম
৩. রুক্মিণী দেবীর প্রতি শ্রীকৃষ্ণ
৪. কেকয়ীর প্রতি দশরথ
৫. শূর্পণখার প্রতি লক্ষ্মণ
৬. দ্রৌপদীর প্রতি অর্জ্জুন
৭. ভানুমতীর প্রতি দুর্য্যোধন
৮. দুঃশলা দেবীর প্রতি জয়দ্রথ
৯. জাহ্নবীর প্রতি শান্তনু
১০. উর্ব্বশীর প্রতি পুরুরবা
১১. জনার প্রতি নীলধ্বজ

এছাড়া, রামকুমার নন্দী মজুমদারের কাব্যের শুরুতে রয়েছে 'সরস্বতী দেবী'-র বন্দনা অংশ। যা মাইকেলের কাব্যে অনুপস্থিত। এরপর 'কল্পনা' ও 'মাইকেল' অংশ উল্লেখ করে কাব্যের মোট এগারোটি সর্গ ক্রমানুযায়ী বর্ণিত হয়েছে।

বক্ষ্যমান প্রবন্ধের শেষে এসে বলা যায়, যে, উত্তর-পূর্ব ভারত তথা বরাক-সুরমা উপত্যকার প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্যচর্চার ধারায় এক গুপ্ত রত্ন ছিলেন মধুসূদন অনুসারী কবি রামকুমার নন্দী মজুমদার। কিন্তু গভীর পরিতাপের বিষয় যে, তাঁকে এবং তাঁর সৃষ্টিকর্ম নিয়ে যতটা আলোচনা তথা গবেষণা হবার কথা ছিল আজও পর্যন্ত তা হয়ে উঠেনি। এর মূলে হয়তো রয়েছে কবির প্রান্ত অঞ্চলে বেড়ে ওঠা। তবু তাঁর মৌলিক সৃষ্টকর্মের জন্য আজও বরাক-সুরমা উপত্যকার আপামর বাঙালি পাঠকদের হৃদয়ে অমর হয়ে রয়েছেন।

চিত্র: অন্তর্জাল থেকে সংগৃহীত, বিশিষ্ট ব্যক্তিদের দ্বারা কবির আবক্ষ মূর্তি উন্মোচনের বিশেষ মুহূর্ত।

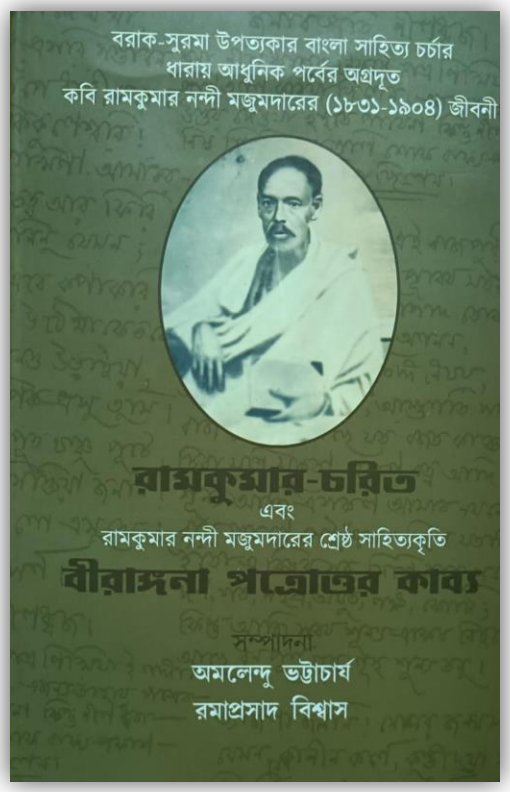

কবি রামকুমার নন্দী মজুমদার-কে নিয়ে সদ্য প্রকাশিত পুনর্মুদ্রিত গ্রন্থের প্রচ্ছদ

সূত্রনির্দেশ:

১. অমলেন্দু ভট্টাচার্য ও রমাপ্রসাদ বিশ্বাস সম্পাদিত, 'বরাক-সুরমা উপত্যকার বাংলা সাহিত্য চর্চার ধারায় আধুনিক পর্বের অগ্রদূত কবি রামকুমার নন্দী মজুমদারের (১৮৩১-১৯০৪) জীবনী রামকুমার চরিত এবং রামকুমার নন্দী মজুমদারের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকৃতি বীরাঙ্গনা পত্রোত্তর কাব্য', অক্ষর পাবলিকেশানস্, আগরতলা, পুনর্মুদ্রিত সংস্করণ ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৩, পৃ. ১৫
২. তদেব, পৃ. ১৫
৩. তদেব, পৃ. ১৬৩-১৬৪
৪. তদেব, পৃ. ১৬৪
৫. তদেব, পৃ. ৩৬
৬. তদেব, পৃ. ৪১
৭. তদেব, পৃ. ৪৩

৮. তদেব, পৃ. ৪৩
৯. তদেব, পৃ. ৪৪
১০. তদেব, পৃ. ৪৫
১১. তদেব, পৃ. ৪৫
১২. তদেব, পৃ. ৪৫
১৩. তদেব, পৃ. ৪৬
১৪. তদেব, পৃ. ৫২
১৫. তদেব, পৃ. ৯২
১৬. তদেব, পৃ. ৯১
১৭. তদেব, পৃ. ৮০
১৮. তদেব, পৃ. ৮০
১৯. তদেব, পৃ. ৬২-৭২
২০. তদেব, পৃ. ৬৩
২১. তদেব, পৃ. ৪৭
২২. তদেব, পৃ. ৬৪
২৩. তদেব, পৃ. ৭০
২৪. তদেব, পৃ. ২৪
২৫. তদেব, পৃ. ২৫
২৬. তদেব, পৃ. ৬৬
২৭. তদেব, পৃ. ৬৭
২৮. তদেব, পৃ. ৬৮
২৯. তদেব, পৃ. ১৫৭
৩০. ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায় সম্পা.: 'মাইকেল মধুসূদন দত্তের বীরাঙ্গনা কাব্য', জয়দুর্গা লাইব্রেরী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ মে ২০০৭, পৃ. ১৮৫-২১০

ঋণ স্বীকার:

১. বিশিষ্ট লোকসংস্কৃতি গবেষক অমলেন্দু ভট্টাচার্য, শিলচর, অসম
২. শিবব্রত দত্ত, সভাপতি, মদনমোহন আখড়া পরিচালন সমিতি, তারাপুর, শিলচর-৩